বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র

ইউনিট ১১

ভূমিকা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের বস্ত্রের অতীত ইতিহাস খুবই সমৃদ্ধশালী। সূদুর প্রাচীনকালে এসব বস্ত্র বিদেশীদের কাছেও বেশ সমাদৃত ছিল। বিপ্লবের প্রাকশিল্প যুগে বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র। বাংলাদেশের মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। ঊনিশ শতকের মধ্য ভাগে ইংরেজ শাসনামলে এই শিল্পে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। ইংরেজদের হাতে এদেশের শাসন ভার চলে যাওয়ার পর এদেশের বস্ত্রশিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। ইংরেজরা মেশিনে তৈরি তাদের দেশের বস্ত্র এদেশে প্রচলন করার জন্য তাঁতিদের উপর অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের আঙ্গুল কেটে দেয়। ১৯০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে অন্যান্য জিনিসের সাথে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে স্বদেশী আন্দোলনে দেশপ্রেমিক জনগন বিদেশী বস্ত্র বর্জন শুরু করে। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁতবস্ত্র আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর এ শিল্পের যাত্রা আবার শুরু হয়। বৃটিশ শাসকদের নির্মম অত্যাচার, স্বাধীনতা যুদ্ধে মিল কারখানার ব্যাপক ক্ষতি, সুতা ও রংয়ের অভাব ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এদেশের তাঁতশিল্প ধীরে ধীরে আবার বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে এদেশের তাঁতশিল্প প্রসার ব্যাপক। এদেশের তাঁতশিল্পগুলো প্রধানত ঢাকা, পাবনা, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, কুমিল্লা ইত্যাদি এলাকায় গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের সকল স্তরের মানুষ তাঁতের তৈরি বস্ত্র ব্যবহার করে। বাংলাদেশের ঐতিহবাহী বস্ত্রগুলোর মধ্যে জামদানি, মণিপুরি তাঁত, টাঙ্গাইল তাঁত, রাজশাহী সিল্ক, বেনারসি , খদ্দর অন্যতম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১ : ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র-জামদানি ও সিল্ক
পাঠ - ১১.২ : মণিপুরি তাঁত ও টাঙ্গাইল তাঁত
পাঠ - ১১.৩ : বেনারসি ও খদ্দর
পাঠ - ১১.৪ : ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির পোশাক-মণিপুরি ও খাসিয়া
পাঠ - ১১.৫ : চাকমা, রাখাইন ও সাঁওতাল
ব্যবহারিক
পাঠ - ১১.৬ : বস্ত্রখন্ড দিয়ে শিল্পকর্ম প্রস্তুতকরণ

পাঠ-১১.১ ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র-জামদানি ও সিল্ক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জামদানি শিল্পের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- জামদানি শাড়ির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- জমিনের নকশা ও পাড়ের নকশা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেশম পোকা থেকে সিল্ক তন্তু তৈরি পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- সিল্ক বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

জামদানি

জামদানি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র। বর্ণ বৈচিত্র্য আর নকশার ভিন্নতার জন্য জামদানি অপরূপ। জামদানি মসলিনের উত্তরসূরী। জামদানি শব্দটি ফরাসী শব্দ থেকে এসেছে। জাম হচ্ছে পারস্য দেশীয় উৎকৃষ্ট এক শ্রেণির সুতা, আর দানি হচ্ছে বাটি বা পেয়ালা। অর্থাৎ জামদানি হচ্ছে উৎকৃষ্ট সুতার ধারণকারী। ধারণা করা হয়, ইরানী বাদশাহর পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু সংখ্যক তাঁতিদের সহযোগিতায় ঢাকায় জামদানির বুনন কাজ শুরু হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ছিলেন জামদানির বিশেষ গুণগ্রাহী। মুর্শিদাবাদের নবাবরাও জামদানির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জামদানি শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প তার অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জামদানি বস্ত্র উৎপাদন শুরু করে। ক্রমে ক্রমে এ বস্ত্র প্রসার লাভ করতে থাকে। রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ, নরসিংদী, ডেমরা, রূপসী, আড়াইহাজার ইত্যাদি এলাকায় জামদানি প্রস্তুত করা হয়।

চিত্র ১১.১.১ : জামদানি শাড়ি

জামদানি শাড়ির বৈশিষ্ট্য

জামদানির সুতা

জামদানি বস্ত্র তৈরিতে সুতি, নাইলন ও রেশম সুতা ব্যবহার হতো। কিন্তু বর্তমানে রেশম সুতার বদলে সুতি সুতাই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। জামদানির সুতা রং করতে ভেষজ রং ব্যবহার করা হয়। জামদানি বস্ত্রের প্রধান উপাদান সুতা। সুতার সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে জামদানি বস্ত্রের মান ও গুণাগুণ।

জামদানির কারিগর

জামদানি বস্ত্র বয়নের জন্য প্রতি তাঁতে দু'জন কারিগর থাকেন। একজন দক্ষ কারিগর অপরজন সাহায্যকারী কারিগর। মূল কারিগর তাঁতের ডান পাশে বসেন ও বস্ত্রের মূল নকশা প্রণয়ন করেন। সাহায্যকারী কারিগর তাঁতের বাদিকে বসেন ও প্রণীত নকশা অনুসারে হাত ও পায়ে তাঁত চালান।

জামদানির নকশা

চারপাশের প্রাকৃতিক বস্তু থেকে ধারণা নিয়ে জামদানি বয়নকারী নিজের মন থেকে সরাসরি কাপড়ে নকশা প্রয়োগ করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন মোঘল আমলে ইরান, ইরাক থেকে মুসলিম ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় কার্পেটের নকশাগুলো এদেশে এসেছে। এ নকশাগুলো জামদানির কারিগর সম্প্রদায় জামদানি বয়নে ব্যবহার করেছে। কারো কারো মতে প্রতিটি জামদানির নকশায় রয়েছে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন ও বৃক্ষলতা। কেউ কেউ মনে করেন চাকমা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নকশা থেকে এসেছে জামদানি শাড়ির নকশা।

জমিনের নকশা

জমিনের নকশা তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয় তা হলো- বুটা, জাল ও তেসরী।

- বুটা নির্দিষ্ট দূরত্বে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। প্রচলিত বুটাগুলোর নাম হলো- আশরাফী ফুল, গিল ফুল, গাঁদা ফুল, পোনা ফুল, পোনা বুটি, ডালিম, শাপলা, সুরমাদানী, জুঁইফুল, পাতা বাহার, চিতা ফুল, তারা ফুল, গরুর সিং, ডুমুর ফল, চিড়া পাতা ইত্যাদি।
- জাল বুটিগুলো পরস্পর সংযুক্ত। দুবলীজাল, হাবলা, আংটি, ককিসমটর, মারুলী, বেলপাতা, শংখ, নিমপাতা ইত্যাদি।
- কোণাকুণি করে অলংকরণের নাম তেসরী। বিভিন্ন ধরনের তেসরী নকশার নাম হলো করাত চেলা, সাবুদানা, কলারফানা, ডালিম, পুঁইলতা, চিনির বাসন, ভাঙ্গা করাত, আটু ভাঙ্গা ইত্যাদি।

পাড়ের নকশা

নকশাভেদে জামদানি শাড়ির পাড়ের নাম ভিন্ন হয়। যেমন–ইঞ্চি পাড়, কলকা, পুইতল, দুবলা, করলা, কাঠি, সিক, সুচ, কাঁচি, সাল, শামুক, চাঁদ মরালী, টাংগাইলা গাছ ইত্যাদি।

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জামদানি বহুল পরিচিত এবং সমাদৃত। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জামদানির ব্যবহার হয়ে থাকে। জামদানি নকশা শুধু শাড়ি, ওড়না, কামিজ তথা নারীদের পোশাকে সীমাবদ্ধ নয়। পাঞ্জাবি, চাদর, দেয়াল সজ্জায়ও এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
জামদানি কারিগর আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল। এ কারণে তারা বৃহৎভাবে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারছে না। সরকার ও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতাই পারে এ শিল্পের আরও ব্যাপক প্রসার ঘটাতে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জামদানি শাড়ির নকশাসমূহের বিবরণ দিন।

সিল্ক বস্ত্র

সৌন্দর্য ও অভিজাত্যের জন্য সিল্ককে তন্তুর রাণী বলা হয়। মোঘল আমল থেকেই রাজশাহীতে রেশম চাষ শুরু হয়। সিল্ক কাপড়ের জন্য একসময় রাজশাহী পরিচিত হয় সিল্ক নগরী হিসেবে। রেশম কাপড়ের লাল পাড় গরদ শাড়ি, গরদের পাঞ্জাবি, মটকা শাড়ি ছাড়া বাঙালির বিয়ে পার্বণ কল্পনা করা যেত না। সিল্ক এর জন্ম চীন দেশে।
রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় সিল্কের সুতা। গরমের সময় রেশম পোকা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো বসন্তের প্রথম দিকে ফেটে যায়। পোকা বের হয়ে আসে। পোকাগুলো তুঁত গাছের পাতা খেয়ে বড় হয়। বড় হওয়ার পর পোকাগুলোর মুখ দিয়ে লালা বের হয়। পোকাগুলো ককুন নামক আবরণের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত

চিত্র ১১.১.২ : রাজশাহী সিল্ক

করে ফেলে। ককুনের ভিতর পোকাগুলো মথে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কিছু মথ ককুন কেটে বের হতে দেয়া হয় বংশ বিস্তারের জন্য। বাকিগুলোকে গরম পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা হয়। গরম পানিতে সিদ্ধ করার পর ককুন থেকে আঠা জাতীয় সেরিসিন দূর হয় এবং বেরিয়ে আসে রেশম তন্তু। এ তন্তু আরও প্রক্রিয়াজাত করে সুতা ও বস্ত্র তৈরি করা হয়।

সিল্ক বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

- সিল্ক তন্তু বেশ উজ্জ্বল হওয়ায় উৎসবের পোশাক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- ব্লক, বাটিক, টাইডাই করে রেশম বস্ত্রের আভিজাত্য ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করা যায়।
- কোট, শেরওয়ানির ভিতরের আস্তরণে রেশম কাপড় ব্যবহৃত হয়।
- এই বস্ত্র বেশ দামী তাই সবাই ব্যবহার করতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	অভিজাত বস্ত্র হিসেবে সিল্ক ও জামদানির গুরুত্ব উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র জামদানি তার বর্ণ বৈচিত্র্য ও নকশার অভিনবত্বের জন্য অনন্য। রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ, নরসিংদী, ডেমরা, রূপসী, আড়াইহাজার ইত্যাদি এলাকা জামদানি প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতার সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে এর গুণগত মান। জামদানি শাড়ির বাহারি পাড় ও জমিনের নকশাই এর মূল আকর্ষণ। সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রতীক সিল্ক। রেশম পোকার কাকুন থেকে তৈরি হয় রেশম তন্তু। এ তন্তু বেশ উজ্জ্বল ও রেশমি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জামদানি বস্ত্র বয়নের জন্য প্রতি তাঁতে ক'জন কারিগর থাকেন?
ক) একজন খ) দু'জন
গ) তিনজন ঘ) চারজন

২। সিল্ক তন্তু তৈরি হয় কোথা থেকে?
ক) রেশম পোকা থেকে খ) রেশম পোকার ডিম থেকে
গ) রেশম পোকার লালা থেকে ঘ) রেশম পোকার ককুন থেকে

৩। জামদানি শাড়ির বৈশিষ্ট্য হল-
i) জামদানির সুতা
ii) জামদানির কারিগর
iii) জামদানির নকশা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) ii খ) iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সিল্ক বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল-
i) উজ্জ্বলতা ii) অমসৃণতা iii) আভিজাত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.২ মণিপুরি তাঁত ও টাঙ্গাইল তাঁত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মণিপুরি তাঁতবস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- টাঙ্গাইল তাঁতবস্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

মণিপুরি তাঁতবস্ত্র

মণিপুরি সম্প্রদায়ের শতকরা ৯০ ভাগ মহিলা তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর, তিলকপুর, মাধবপুর ও শ্রীমঙ্গলের রামনগরে মণিপুরি সম্প্রদায়ের অধিকাংশের বসবাস। মণিপুরিদের প্রতিটি বাড়িতে বাঁশ ও কাঠের তৈরি "জঙ্গম" এবং খাঁড় তাঁত রয়েছে। আঞ্চলিকভাবে এ সমস্ত তাঁতকে বেইন বলা হয়। এসব তাঁত দিয়ে শাড়ি, বিভিন্ন প্রকার চাদর, বেড কভার, ওড়না, গামছা, ব্যাগ ইত্যাদি বোনা হয়।

চিত্র ১১.২.১ : মনিপুরী তাঁতবস্ত্র

মণিপুরি তাঁতের বৈশিষ্ট্য

- মণিপুরি বস্ত্রের উপর যে নকশা তৈরি করা হয় তা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত। যেমন– ফুল পাতা, জীবজন্তুর আকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- কোন কোন বস্ত্রে জ্যামিতিক নকশাও দেখা যায়। বর্তমানে তারা বাটিক নকশার অনুকরণেও নকশা করে থাকে।
- স্থানীয়ভাবে তারা নিজেরাই তৈরি করে বাঁশ ও কাঠের তাঁত। মণিপুরিরা তাদের তৈরি শাড়িগুলো নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রস্তুত করে। মণিপুরিদের এসব পণ্য বিভিন্ন মেলায় এমনকি বাণিজ্যিক মেলায়ও প্রদর্শিত হচ্ছে। পাশাপাশি রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরে অভিজাত মার্কেটগুলোতে এসব পণ্য সরবরাহ হচ্ছে।

টাঙ্গাইল তাঁতবস্ত্র

টাঙ্গাইল শাড়ির অতীত ইতিহাস আজও অজানা । ইতিহাসবিদদের মতে, বুনন শিল্পের সাথে জড়িত মানুষের জীবন ছিল যাযাবরের মত। সিন্ধু নদীর তীরে ছিল এদের পূর্ব পুরুষের বাস। রাজা লক্ষণ সেনের আমলে তাঁতি সম্প্রদায়ের কিছু লোক এদেশের ধামরাই ও টাঙ্গাইলে এসে জীবিকার অন্বেষণে বসবাস করতে শুরু করে। ধামরাইয়ে আসা তাঁতিরা পেশা পরিবর্তন করে। কিন্তু টাঙ্গাইলের তাঁতিরা আজও তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রেখেছে। সে সময় কাপড় বিখ্যাত ছিল বুনন শৈলী ও রং এর বিন্যাসের জন্য। প্রাচীনকাল থেকেই টাঙ্গাইল শাড়ি সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো ব্যবহার করে আসছে। ১৯৩০-৩৫ সালের দিকে জ্যাকার্ড মেশিনের প্রচলন শুরু হয়। জ্যাকার্ড মেশিনে মূলত শাড়ির পাড় তৈরি করা হয়। নকশা পাড়ের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে তাঁতের শাড়িতে নকশার কাজ শুরু হয়।

চিত্র ১১.২.২ : টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ি

টাঙ্গাইল তাঁতের বৈশিষ্ট্য

- টাঙ্গাইল শাড়ির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বুনন শৈলী, রং বিন্যাস, ডিজাইন এবং সর্বোপরি শিল্পীর নিজস্ব দক্ষতা।
- পাড়ের নকশার সাথে সংগতি রেখে রঙিন সুতার সাহায্যে জমিনের নকশা।
- বর্তমানে এর সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে রেয়ন সুতা, জরি, মেটালিক জরি।
- টাঙ্গাইল শাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে আবহাওয়া ও পরিবেশের ভূমিকা রয়েছে।

- পানির ভিন্নতার কারণে শাড়ির গুণগত মানের তারতম্য ঘটে। এ শিল্প দেশের অনেক স্থানে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু টাঙ্গাইল শাড়ির দক্ষ তাঁতিদের চেয়ে গুণগতমান নিম্ন থাকায় প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে গেছে।
- বিভিন্ন ধরনের মিহি তাঁতের শাড়ি তৈরি হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাঙ্গাইল সিল্ক, হাফ সিল্ক ও সাধারণ তাঁতের শাড়ি। যে শাড়িতে হাতের কাজ যত বেশি ও শৈল্পিক সেই শাড়ির দামও তত বেশি।

শিক্ষার্থীর কাজ	টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা দিন।

সারাংশ

মণিপুরি তাঁত উৎপাদনের প্রধান অঞ্চলগুলো হল- মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর, তিলকপুর, মাধবপুর ও শ্রীমঙ্গলের রামনগর। মণিপুরি সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ নারীরাই মণিপুরি তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের সাথে জড়িত। তারা তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে প্রস্তুত তাঁতে মণিপুরি বস্ত্র বুনে থাকেন। বর্তমানে এদেশের মণিপুরি বস্ত্রের জনপ্রিয়তা ও চাহিদা প্রচুর। টাঙ্গাইল তাঁতের ইতিহাস অজানা হলেও বলা হয় যে, সিন্ধু নদীর তীরাঞ্চল থেকে জীবিকার প্রয়োজনে আগত তাঁতিরা ধামরাই ও টাঙ্গাইলে এসে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের বংরশধরেরাই তাদের পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রেখে বিচিত্র বুনন শৈলী, রং বিন্যাস, নকশাসমৃদ্ধ তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করে চলেছে। টাঙ্গাইলের তাঁত বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য টাঙ্গাইল সুতি, সিল্ক, হাফ সিল্ক ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মণিপুরিদের তৈরি জঙ্গম এবং খাঁঙ তাঁত কী উপাদানে তৈরি?
ক) বাঁশ ও বেত খ) বাঁশ ও কাঠ
গ) বেত ও কাঠ ঘ) বাঁশ

২। বাংলাদেশে বসবাসকারী টাঙ্গাইলের তাঁতিদের পূর্বপুরুষের বাস কোথায় ছিল?
ক) সিন্ধু নদীর তীরে খ) যমুনা নদীর তীরে
গ) গঙ্গা নদীর তীরে ঘ) তিস্তা নদীর তীরে

৩। টাঙ্গাইল শাড়ি বিখ্যাত ছিল-
i) বুনন শৈলী ও রং এর বিন্যাসের কারণে
ii) নকশার কারণে
iii) সুলভ মূল্যের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

৪। মনিপুরি বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো-
i) মণিপুরিরা নিজেরাই ইচ্ছেমত নকশা করে
ii) স্থানীয়ভাবে নিজেদের তৈরি তাঁতে কাপড় বোনে
iii) মণিপুরি বস্ত্রের নকশায় মানব আকৃতি প্রাধান্য পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i ও ii

পাঠ-১১.৩ বেনারসি ও খদ্দর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বেনারসি বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- খদ্দর বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

বেনারসি

বেনারসি শাড়ির উৎপত্তি হয় ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্যতম প্রাচীন নগর বেনারস এ। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর কিছু বেনারসি তাঁতি সম্প্রদায় এদেশে এসে ঢাকার বসতি স্থাপন করে। স্বাধীনতার পর এসব তাঁতিরা সবাই মিরপুর এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। সেখান থেকেই এদেশে কাতান শাড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বেনারসি শাড়ির পরিবর্তিত নাম কাতান। এই শাড়ি উৎপাদনকারীদের প্রায় সবাই অবাঙালি। বর্তমানে কিছু বাঙালিও এ শাড়ি বোনার কাজ করছে। বেনারসি উৎপাদনের জন্য সমস্ত কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয় যা এই শাড়ি তৈরিতে রেশম ব্যবহৃত হয়। সাধারণত চীন, থাইল্যান্ড, ভারত থেকে সুতা আমদানি করতে হয়।

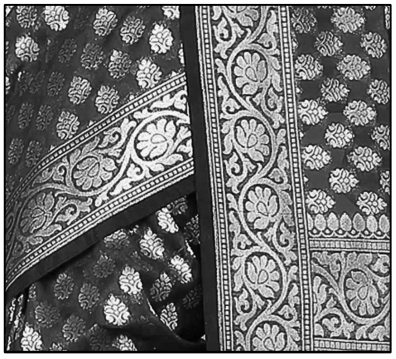

চিত্র ১১.৩.১ : মিরপুরের কাতান

বেনারসি শাড়ির বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশের রাজশাহী সিল্ক ও রেয়ন সুতা দিয়েও এই কাতান বোনা হয়। এই শাড়িতে জরি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন রংয়ের জমকাল সোনালি জরির সুতার কাজ ক্রেতাদের মন কেড়ে নেয়। মিরপুর কাতান শাড়ি তৈরিতে সাধারণত : সুতা অবস্থায় রং প্রয়োগ করা হয়।
- কাতান শাড়ি সাধারণত হস্তচালিত তাঁতে হয়ে থাকে। এ শাড়ি বুননের জন্য যে তাঁত ব্যবহার করা হয় তাকে বেনারসি তাঁত বলা হয়। এই তাঁতের সাথে জ্যাকোর্ড তাঁত সংযুক্ত করে শাড়ির উপরে নকশা বা ডিজাইন করা হয়।
- বেনারসির চমক লাগানো রং বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা ফ্যাশন সচেতনদের আকৃষ্ট করে। সাধারণত: লাল রংয়ের কাতান শাড়ি বিয়ের শাড়ি হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। বেনারসির জমিন খুব মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। এর বুনানি খুব ঘন ও মিহি হয় বলে ব্যবহারে আরামদায়ক। তবে জরির কারুকার্য থাকার ফলে কিছুটা খসখসে।
- জাকোর্ড বুননে প্রস্তুত বলে এ বস্ত্র অনেক টেকসই ও মজবুত।
- নকশাই মিরপুর কাতান শাড়ির প্রাণ। নকশাভেদে শাড়ির নামকরণ করা হয় যেমন- সানন্দা কাতান, খুশবু, আনারকলি কাতান, ব্রোকেট, অলওভার কাতান ইত্যাদি।

খদ্দর বস্ত্র

কুমিল্লার খদ্দরের ব্যাপকতার কারণ সম্পর্কে নানা কথা রয়েছে। তবে এটির জনপ্রিয়তার পেছনে মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেন। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদেশী কাপড় বর্জন করে দেশীয় তুলায়, চরকায় কাটা সুতা দিয়ে তাঁতে তৈরি কাপড় ব্যবহারের আহবান জানান তিনি। এর প্রেক্ষিতে ১৯২১ সালে নিখিল ভারত তন্তু সমবায় সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় কুমিল্লা শহরে। সে সময়ে খদ্দর কাপড়ের ব্যবহার বেড়ে যায়। খদ্দর শব্দটি এসেছে গুজরাটি শব্দ থেকে। মহাত্মা গান্ধীর বাড়ি গুজরাটে। কেউ কেউ মনে করেন খদ্দর নামকরণটি মহাত্মা গান্ধীরই দেয়া। পরবর্তীতে মুসলমানরাও তাঁত শিল্পে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে।

খদ্দরের পাঞ্জাবি পুরুষের পছন্দের পোশাক। এছাড়াও শার্ট, ফতুয়া, বেড কভার, বেড শিট, পর্দার কাপড়, সোফার কভার শীতকালে ব্যবহারের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের শাল প্রভৃতি খদ্দর কাপড় দিয়ে তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরনের খদ্দরের কাপড় গজ হিসেবে পাওয়া যায়।

খদ্দর বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য

- ফ্যাশন সৃষ্টিতে খদ্দর বস্ত্রের ভূমিকা অনন্য। খদ্দর কাপড় সস্তা, সহজলভ্য। পাতলা ও মোটা উভয় ধরনের খদ্দরের কাপড় পাওয়া যায়। খদ্দর কাপড় আরামদায়ক। শীত–গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে পরিধানযোগ্য। বহুমুখি কাজে ব্যবহার করা যায়। যেমন– পাঞ্জাবি, সালোয়ার, কামিজ, ফতুয়া, শাড়ি ইত্যাদি।
- কুমিল্লার খদ্দরের উপর বাটিক, ব্লক, টাইডাই প্রিন্ট ও অ্যাপ্লিক ইত্যাদি সুচিকর্ম করে খদ্দর বস্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।
- কুমিল্লার খদ্দরের তৈরি পোশাক নানা শ্রেণির ও পেশার মানুষের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে মন জয় করেছে।

চিত্র ১১.৩.২ : কুমিল্লার খদ্দর

শিক্ষার্থীর কাজ	কুমিল্লার খদ্দর কাপড়ের জনপ্রিয়তার কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?

সারাংশ

ভারতের উত্তর প্রদেশের বেনারস থেকে ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছু বেনারসি তাঁতি সম্প্রদায় প্রথমে ঢাকার মোহাম্মদপুর এবং স্বাধীনতার পর মিরপুর এলাকায় বসতি গড়ে তোলে। এখান থেকেই এদেশে বেনারসি শাড়ি বা কাতান শাড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বেনারসি শাড়ি রেশম তন্তু দিয়ে প্রস্তুত হয়। জরির ব্যবহার একে আকর্ষণীয় করে। নকশার নান্দনিকতায় এবং বৈচিত্র্যের এ শাড়ির বিভিন্ন ধরনের নামকরণ করা হয়, যেমন- সানন্দা, ব্রোকেট, অলওভার, কাতান ইত্যাদি। কুমিল্লার খদ্দর সস্তা, সহজলভ্য, আরামদায়ক এবং শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতে পরিধানযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বেনারসি শাড়ির জমিনের বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি?
ক) মসৃণ ও অনুজ্জ্বল খ) অমসৃণ ও অনুজ্জ্বল
গ) অমসৃণ ও উজ্জ্বল ঘ) মসৃণ ও উজ্জ্বল

২। খদ্দর বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো-
i) সস্তা ii) আরামদায়ক iii) শীত-গ্রীষ্মে পরিধানযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) ii ও iii খ) i, ii ও iii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৩। বেনারসি শাড়ি টেকসই ও মজবুত হওয়ার কারণ কী?
ক) শাড়িতে জরি ব্যবহৃত হয়
খ) রেশম ও রেয়ন সুতা ব্যবহৃত হয়
গ) জ্যাকোর্ড বুননে প্রস্তুত হয়
ঘ) বেনারসি শাড়ি সব কাঁচামাল আমদানিকৃত

পাঠ-১১.৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক-মণিপুরি ও খাসিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে অবস্থানরত মণিপুরি ও খাসিয়া সম্প্রদায় আবাস অঞ্চলসমূহ বলতে পারবেন;
- মণিপুরি ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- মণিপুরি ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর পোশাকের বিবরণ দিতে পারবেন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা অতীত ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও পোশাক পরিচ্ছদের দিক থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। এদের পোশাক পরিচ্ছদের স্বাতন্ত্র্যকে আধুনিক পোশাকের ডিজাইন তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে আমরা পোশাকে বৈচিত্র্য আনতে পারি। বাংলাদেশে অবস্থানরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো ।

মণিপুরি

মণিপুরিরা বাংলাদেশের মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও সুনামগঞ্জে বসবাস করছে। মণিপুরিদের দৈহিক গড়ন খুবই মজবুত, উচ্চতা মাঝারি। এদের কোমর কিছুটা চিকন হলেও বুকের ছাতি ও পায়ের গোড়ালি অনেকটা স্বাভাবিক। গায়ের রং শ্যামলা এবং ফর্সা উভয় রকমের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে দুটি ভাষা প্রচলিত– (১) বিষ্ণুপিয়া ভাষা (২) মৈতৈ ভাষা। এদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ ও শাক-সবজি। মণিপুরিরা মার্জিত রুচিসম্মত ও আত্মনির্ভরশীল একটি জাতি।

মণিপুরিদের পোশাক পরিচ্ছদ

মণিপুরিদের পোশাক পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই স্বগৃহে বাঁশের তাঁতে তৈরি করে। অতি সাধারণ পোশাক তারা পরিধান করে।

- পুরুষ–পুরুষেরা পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি পরে। ছেলেরা আংটি পরে।
- মহিলা–মেয়েরা কোমর অবধি এবং মহিলারা বুক আবৃত করা লাহিং (এক প্রকার ঘাগড়ার মত) পরিধান করে। এর সাথে ব্লাউজ (আহিং) পরিধান করে। এছাড়াও মেয়েরা ওড়না পরে। আর্যীয় বংশোদ্ভুত মহিলারা গৃহাঙ্গনে শাড়ি ব্যবহার করে। স্বর্ণালংকার মণিপুরি মহিলাদের খুবই পছন্দ। সে কারণে মহিলারা হাত, নাক, কান ও গলায় যাবতীয় স্বর্ণালংকার পরিধান করে। মেয়ে ও মহিলারা কপালে টিপ দেয় এবং বিবাহিত মহিলারা সিঁথিতে সিঁদুর পরে। সুন্দর, চাকচিক্য, রুচিসম্মত যেকোন ধরনের প্রসাধনী সামগ্রীর প্রতি মণিপুরি মহিলাদের প্রবল আকর্ষণ। চুলে বেণী বাঁধাসহ খোঁপায় ফুল জড়াতে পছন্দ করে।

চিত্র ১১.৪.১ : মনিপুরী নারী

খাসিয়া

সিলেটের সীমান্তবর্তী অঞ্চল-জৈন্তিয়া পাহাড়, তামাবিল, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় খাসিয়াদের বাস। খাসিয়ারা আদি মঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য হলো-দেহের রং ফর্সা, নাক চ্যাপটা, উচ্চতা

খর্বাকৃতির, চোখ ছোট, মুখাকৃতি গোলাকার, চিবুক উন্নত, দাড়ি গোঁফ হালকা পাতলা। খাসিয়া নারী-পুরুষ সুঠাম দেহের অধিকারী ও কঠোর পরিশ্রমী। খাসিয়ারা কৃষি কাজের উপর বেশি নির্ভরশীল। তাদের প্রধান উপজীব্য ফসল হল পান।

খাসিয়াদের পোশাক পরিচ্ছদ

- মহিলা – খাসিয়াদের পোশাক পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ ও পরিচ্ছন্ন। মেয়েরা নিজেদের তৈরিকৃত "কাজিম পিন" নামক এক ধরনের ব্লাউজ ব্যবহার করে। তাছাড়া তারা এক প্রকারের কাপড়ের বেল্ট কোমরে পরিধান করে। 'কা-জৈন-সেম' নামক সিল্কের তৈরি লুঙ্গির মত কাপড় পরিধান করে। খাসিয়া মহিলারা গহনা অলংকার খুবই পছন্দ করে। বিশেষত মহিলারা গলায়, হাতের কব্জি ও আঙ্গুলে এবং কানে সোনার গহনা পরে। খাসিয়া মহিলারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর গহনা পরার সুযোগ পায়।
- পুরুষ – পুরুষরা পকেট বিহীন জামা ও লুঙ্গি পরিধান করে। খাসিয়া ভাষায় একে "ফুংগ মারুং" বলা হয়। ছেলেরা বৈবাহিক সম্পর্ক সূত্রে একমাত্র আংটি পরিধান করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মণিপুরি ও খাসিয়া জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পোশাকের বর্ণনাসহ নাম লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লাহিং এবং আহিং কোন নৃ-গোষ্ঠীর পোশাকের নাম?
ক) মণিপুরি খ) খাসিয়া
গ) চাকমা ঘ) রাখাইন

২। 'কাজিম পিন' ও ' কা- জৈন- সেম' কোন নৃগোষ্ঠীর পোশাকের নাম?
ক) মণিপুরি খ) খাসিয়া
গ) চাকমা ঘ) সাঁওতাল

৩। ফুংগ মারুং হল-
i) মণিপুরিদের নারীদের পোশাক বা
ii) খাসিয়া নারীদের পোশাক
iii) খাসিয়া পুরুষদের পোশাক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) ii ও iii

সারাংশ

মণিপুরি পুরুষরা পাহাতি, ধুতি, পাঞ্জাবি এবং নারীরা লাহিং এবং ব্লাউজ বা আহিঙ ও সাথে ওড়না পরে থাকে। নারীদের স্বর্ণালাংকার ও চাকচিক্যময় রুচিসম্মত প্রসাধনী ব্যবহার এবং খোঁপায় ফুল গোঁজা খুবই পছন্দ। খাসিয়া সম্প্রদায়ের পোশাক খুবই সাধারণ ও পরিচ্ছন্ন। নারীরা 'কাজিম পিন' নামক এক ধরনের ব্লাউজ, কাপড়ের বেল্ট ও 'কা-জৈন-সেম' নামক সিল্কের তৈরি লুঙ্গি পরিধান করে। খাসিয়া নারীরা প্রচুর সোনার গহনা পরে থাকে। পুরুষরা 'ফুংগ মারুং' নামক পকেটবিহীন জামা ও লুঙ্গি পরে।

পাঠ-১১.৫ চাকমা, রাখাইন ও সাঁওতাল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে অবস্থানরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা, রাখাইন ও সাঁওতালদের বসবাসের অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- চাকমা, রাখাইন ও সাঁওতালদের দৈহিক গড়নের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- চাকমা, রাখাইন ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের পোশাকে বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।

চাকমা

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জুড়ে সমগ্র পার্বত্য জেলায় চাকমারা বসবাস করছে। দৈহিক গড়নে এরা শক্তিশালী, উচ্চতায় প্রায়ই মাঝারি, আবার অনেকে দীর্ঘকায় হয়ে থাকে। চ্যাপ্টা নাক ও ক্ষুদ্র চোখ লক্ষ্য করা যায়। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

চাকমাদের পোশাক পরিচ্ছদ

- পুরুষ–চাকমা পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে প্রধানত: ধুতি, পাঞ্জাবি ও গামছা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তারা কোট ও কখনো মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করে।
- মহিলা–মেয়েরা সাধারণত কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত নীল কাপড়ের ওপর লাল ডোরাকাটা স্কার্ট, বুকে ব্রেস্ট ক্লথ এবং মাথায় সাদা শিরস্ত্রান পরিধান করে। মহিলাদের ব্যবহার্য পরিধানে আছে পিনোন খাদী ও খাদাং ইত্যাদি। শিক্ষিত নারীরা শাড়ি ও ব্লাউজ পরিধান করে। চাকমা নারীরা রূপার অলংকার ও পুঁতির মালা ব্যবহার করে দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করে।

চিত্র ১১.৫.১ : নিজস্ব পোশাক ও সাজসজ্জায় চাকমা রমনী

রাখাইন

রাখাইনরা মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলের অধিবাসী। তারা নিজেদেরকে "রাক্ষাইন" নামে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। রাখাইন শব্দটি রক্ষা ও রাখাইন এ দুটো পালি শব্দ থেকে এসেছে যার সম্মিলিত অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি। বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলায় রাখাইনরা অধিক সংখ্যায় বাস করে।

রাখাইনদের পোশাক পরিচ্ছদ

- পুরুষ–পুরুষরা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। উক্ত পোশাকের সাথে জ্যাকেটের উপর একটি প্রাংখং চাপিয়ে নিজেদের গাম্ভীর্যকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া মন্দিরে প্রার্থনাকালীন বিভিন্ন ধর্মীয় ও লোকজ অনুষ্ঠানাদি পর্বে মাথায় পাগড়ি পরে- যা তাদের ঐতিহ্যের প্রতীকও বটে।
- মহিলা–মহিলারা স্বহস্তে তৈরিকৃত বাটিকের লুঙ্গি পরে। এর উপর তারা ব্লাউজ পরিধান করে। মেয়েরা হাতে, কানে, গলায়, নাকে, কোমরে ও পায়ে সূক্ষ্ম কারুকাজখচিত বর্ণাঢ্য নকশার সোনা রূপার অলংকার পরে। চুলে বিভিন্ন ধরনের বেণী ও খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় তাজা ফুল গোজা খুবই পছন্দ করে। পায়ে নকশা এঁকে আলতা পরা, কপালে টিপ দেয়া এবং পানমুখে ঠোঁট লাল করতে পছন্দ করে।

সাঁওতাল

বাংলাদেশের রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও দিনাজপুর জেলায় অধিকাংশ সাঁওতাল বাস করে। সাঁওতালদের দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। গায়ের রং গাঢ় কটা বাদামী ও কালো। মাথার খুলি গোল, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু ও চোখ ছোট। চুল কালো, উস্কোখুস্কো, কোঁকড়ানো। আকৃতিগতভাবে সাঁওতালদের সঙ্গে মালয়ী বা চীনাদের কোন সাদৃশ্য নেই। সাঁওতাল সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতার মাধ্যমেই সন্তানের পরিচিতি ও উত্তরাধিকারত্ব নির্ণীত হয়।

চিত্র ১১.৫.২ : নিজস্ব পোশাক ও সাজসজ্জায় সাঁওতাল নারী

সাঁওতালদের পোশাক পরিচ্ছদ

- মহিলা–সাঁওতালদের পোশাক পরিচ্ছদে তেমন কোন জাঁকজমক নেই। মহিলারা মোটা শাড়ি পরিধান করে এর এক অংশ দিয়ে লজ্জা নিবারণ করে এবং অপর অংশ দিয়ে দেহের উপরিভাগ আবৃত রাখে।
- পুরুষ–পুরুষেরা ধুতি ও লেংটি পরিধান করে নিজস্ব সমাজ অঙ্গনে। অবশ্য বাইরের সমাজ জীবনে স্বাভাবিক পোশাকও ব্যবহার করে।

সারাংশ

চাকমা পুরুষ প্রধানত ধুতি, পাঞ্জাবি ও গামছা পরে। তারা কোট ও পাগড়িও ব্যবহার করে। নারীরা কোমর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত স্কার্ট, বক্ষ বন্ধনী ও মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। এদের পোশাককে পিনোন খাদী, খাদাং ইত্যাদি বলা হয়। রাখাইন পুরুষ লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে। সাথে জ্যাকেটের উপর একটি প্রাংখং থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে পাগড়ি পরে। নারীরা বাটিকের লুঙ্গি ও সাথে ব্লাউজ পরে। সোনা ও রূপার বিভিন্ন গহনা এদের পছন্দ। খোঁপায় তাজাফুল, আলতা, টিপ ইত্যাদি সাজসজ্জা করে থাকে। সাঁওতাল নারীরা মোটা শাড়ি ও পুরুষেরা ধুতি ও লেংটি পরিধান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জ্যাকেটের উপর প্রাংখং পরিধানের প্রচলন কোন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত?

ক) মণিপুরি খ) চাকমা
গ) রাখাইন ঘ) সাঁওতাল

২। পিনোন খাদী ও খাদাং কোন নৃগোষ্ঠীর পরিধেয় পোশাক?

ক) মণিপুরি খ) চাকমা
গ) রাখাইন ঘ) সাঁওতাল

৩। কোন নৃগোষ্ঠীর পুরুষগণ নিজেদের সমাজে ধুতি ও লেংটি পরিধান করে?

ক) মণিপুরি খ) খাসিয়া
গ) রাখাইন ঘ) সাঁওতাল

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্রাবণী এদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, পোশাক, ভাষা সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। বিভিন্ন বইপত্র ঘেঁটে সে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক ও চেহারা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারল।

ক) মণিপুরি সম্প্রদায়ের বসবাস দেশের কোন কোন অঞ্চলে?

খ) খাসিয়া জনগণের নারী ও পুরুষের পোশাকের বর্ণনা দিন।

গ) চাকমা ও সাঁওতালদের পোশাক পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

ঘ) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতীক-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১ : ১। খ, ২। ঘ, ৩। ঘ, ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২ : ১। খ, ২। ক, ৩। ক, ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩ : ১। ঘ, ২। খ, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪ : ১। ক, ২। খ, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৫ : ১। গ, ২। খ, ৩। ঘ

ব্যবহারিক

পাঠ-১১.৫ বস্ত্রখন্ড দিয়ে শিল্পকর্ম প্রস্তুতকরণ

দেয়ালসজ্জার সমগ্রী তৈরি

১। খদ্দর বস্ত্র দিয়ে দেয়ালসজ্জার সামগ্রী তৈরি।
মাপ–২০″ / ১৫″ ।

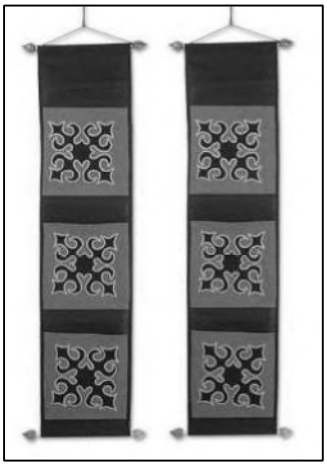

চিত্র ১১.৫.১ : দেয়াল সজ্জা

উপকরণ

১। নির্দিষ্ট মাপের খদ্দর বস্ত্র
২। পেন্সিল
৩। রাবার, স্কেল
৪। ফেব্রিকের বিভিন্ন রং
বা ,বিভিন্ন রংয়ের সুতা
৫। তুলি (বিভিন্ন সাইজ)

প্রস্তুত প্রণালী

১। টেবিলের উপর খদ্দর কাপড়টি টান টান করে বিছিয়ে নিতে হবে।
২। এবার পেন্সিল দিয়ে কাপড়টির উপর নকশা অংকন করতে হবে।
৩। এবার নকশা অনুযায়ী ফেব্রিক রং তুলিতে নিয়ে নকশা অনুযায়ী বস্ত্রটিতে রং বসাতে হবে।
৪। রং করা হলে বস্ত্রটি ছায়ায় শুকাতে হবে।
৫। উল্টা পিঠে ইস্ত্রি করতে হবে।
৬। বিভিন্ন ধরনের রঙিন সুতা ব্যবহার করে সুচিকর্ম দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা যায় । এ ছাড়া ফেব্রিক রং ও রঙিন সুতা দুটিই ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।
৬। এরপর প্রস্তুতকৃত সামগ্রীটি বাঁধাই করতে হবে।

কুশন কভার প্রস্তুতকরণ

কুশন কভারের মাপ সাধারণত ১৬″/ ১৬″ও ১৮″ / ১৮″ হয়। তবে নিজের পছন্দ মত সাইজও তৈরি করা যেতে পারে।

চিত্র ১১.৫.২ : বিভিন্ন ধরনের কুশন কভার

উপকরণ

১। কুশন কভারের মাপ অনুযায়ী খদ্দর বা মণিপুরি তাঁতের কাপড়
২। পেন্সিল, রাবার, স্কেল
৩। রঙিন কাপড়, ফেব্রিক রং
৪। সুই সুতা ,কাঁচি

প্রস্তুত প্রণালী

১। মাপ অনুসারে কাপড়টি কাটতে হবে।

২। মাপ অনুযায়ী কভারের সামনের অংশে নকশা অংকন করতে হবে।

৩। রং তুলির সাহায্যে উক্ত নকশা অনুযায়ী কুশন কভারে রং করতে হবে। অথবা নকশা অনুযায়ী রঙিন সুতা ব্যবহার করে কুশন কভারে বিভিন্ন স্টিচ করতে হবে। অথবা এপ্লিকের কাজ ও করা যেতে পারে। ছবিতে তাঁতের কাপড়ে তৈরি কুশন কভারের ডিজাইন দেয়া আছে। চিত্র থেকে ধারণা নিয়ে নিজ সৃজনশৈলির মাধ্যমে কুশন তৈরি করতে হবে। পেইন্ট বা এপ্লিক বা স্টিচ করা শেষ হলে মেশিনের সাহায্যে বা হাতে কুশন কভারটি সেলাই করতে হবে।

৪। পুরাতন জামদানি শাড়ির পাড়, টাঙ্গাইলের শাড়ির পাড়, বেনারসি শাড়ির পাড় ব্যবহার করে কুশন কভার তৈরি করা যায়। মাপ অনুসারে কুশনের কাপড় কেটে দুই ধারে পাড় বসিয়ে চমৎকার কুশন কভার তৈরী করা যায়।

চিত্র ১১.৫.৩ : বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের ব্যাগ

ব্যাগ তৈরি

মাপ – ১০″. / ১২″ । তবে নিজের পছন্দমত সাইজও তৈরি করা যেতে পারে।

উপকরণ

১। তাঁতের কাপড় – এক গজ

২। চট বা পাতলা ফোম আধা গজ।

৩। পেন্সিল, রাবার, স্কেল

৪। রঙিন কাপড়, ফেব্রিক রং

৫। সুঁই, সুতা

৬। কাঁচি

প্রস্তুত প্রণালী

১। মাপ অনুসারে কাপড় কেটে নিতে হবে বা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হবে।

২। কাপড়ের উপর পছন্দ মত ফেব্রিক, রঙিন সুতা বা বস্ত্র কেটে অ্যাপ্লিকের কাজ করে নিতে হবে।

৩। ফোম বা চট পার্সের মাপ অনুসারে কেটে সেলাই করে বসাতে হবে।

৪। ফোম বা চটের উপর আর এক প্রস্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৫। এবার পার্সের মাপ অনুযায়ী ভাঁজ করে সেলাই করতে হবে এবং বোতাম লাগাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১। শিক্ষার্থীরা ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র খন্ড দিয়ে যে কোন একটি শিল্পকর্ম তৈরি করুন। ২। দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে ব্যাগ তৈরি করুন।